নিয়েলা,
ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি

লুৎফুল কায়সার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূ মি কা

এই যে বইটা লিখে শেষ করলাম, এর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব আমার প্রিয় ভাই ডা. আসিফ তাউজকে দিতে হবে। ভাই সব সময় পাশে থেকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। বইটার প্লট নিয়ে আলোচনা হয়েছে, নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, ভাই কখনও বিরক্ত হননি।

২০১৯ সালে ফিলিপাইনে স্কুলপড়ুয়া ক্রিস্টিন লি-র মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। এতটাও নির্মম মানুষ হতে পারে? এই উপন্যাসিকার প্লট মাথায় এসেছিল ২০২০ সালে, প্যান্ডেমিকের মধ্যে। কিন্তু তখন নানান অনুবাদে ব্যস্ত থাকায় আর লেখা হয়নি।

ক্রিস্টিনের কেসের ব্যাপারে বিস্তারিত বলার দরকার দেখি না, ইন্টারনেটেই অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায়। দেখুন, ক্রিস্টিনের সঙ্গে সত্যিই 'কী' হয়েছিল তা হয়তো আমরা কোনোদিনই জানতে পারব না। আবার কে জানে, হয়তো জানতেও পারি! এই বইতে যা লিখেছি, পুরোটাই আমার কল্পনা।

সবার শেষে ধন্যবাদ বেঙ্গল ট্রয়কা প্রকাশনীর কর্ণধার নিলাদ্রি'দা-কে। অফিসের ব্যস্ততার কারণে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে এত দেরি হওয়ার পরেও দাদা একটুও রাগ করেননি।

বইটি যদি পাঠকদের একটুও ভালো লাগে, তবেই আমি সফল।

লুৎফুল কায়সার
১১. ১১. ২০২৩

প্রারম্ভিকা

৭ সেপ্টেম্বর, ১১৯১
ক্রুসেডার শিবির।

গভীর রাত। আনন্দ উৎসবে মেতে আছে ক্রুসেডার সৈন্যরা। আরসুফের যুদ্ধে জিতেছে ওরা। আইয়ুবিদের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক সেনাবাহিনীকে রীতিমতো কচুকাটা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এক হাজার ক্রুসেডারও মারা যায়নি, কিন্তু আইয়ুবিদের প্রায় আট হাজার সৈন্য মারা গেছে। সুলতান সালাহউদ্দিনের শক্তি অনেকটাই কমে গেছে, একের পর এক পরাজয় বরণ করতে করতে ক্লান্ত লোকটা।

ইংরেজদের অবস্থান শিবিরের একদম বামপাশে। অন্যদের তুলনায় এই শিবিরটা বেশ নীরব। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজা রিচার্ডের কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বেজায় বিব্রত ইংরেজরা। ফরাসিরা তো এটাও বলে বেড়াচ্ছে যে রাজা রিচার্ড আর জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে চান না; লেভান্টের আশেপাশের গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো দখল করেই তিনি ইংল্যান্ডে ফিরতে চান।

নিজের তাঁবুতে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন নর্মান নাইট স্যার অ্যান্ড্রু ভার্নন। রাজা রিচার্ডের কাছের মানুষ তিনি।

এই যুদ্ধ জিতে বেশ অনেকটাই লাভ হয়েছে ক্রুসেডারদের। ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে শক্তি দিন-দিন কমে যাচ্ছে সুলতান সালাহউদ্দিনের। মধ্যপ্রাচ্য আর মধ্য এশিয়ার কোনো বৃহৎ শক্তিও রাষ্ট্রীয়ভাবে সুলতানকে সাহায্য করতে আগ্রহী নয়। বাগদাদের খলিফারও তেমন সহমর্মিতা নেই সুলতানের প্রতি। আসলে ওরা ভয় পাচ্ছে, পাছে মধ্যপ্রাচ্যে আইয়ুবিদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়!

আজকের ভয়াবহ পরাজয়ের পরে বাকি যুদ্ধগুলোতেও যে সালাহউদ্দিন হেরে যাবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রুসেডাররা সম্ভবত জেরুজালেম জিততে পারবে না।

ক্রুসেডার-বাহিনী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত, নাইটরা সবসময় শক্ত বর্ম পরে থাকেন। সে তুলনায় আইয়ুবিদের সেনাবাহিনীর অস্ত্রগুলো বেজায় হালকা। শুরু থেকেই সামনা-সামনি সংঘাত এড়িয়ে চলছিল ওরা, গেরিলা পদ্ধতিতে হামলা করছিল, কিন্তু এখন আর ওতে তেমন কাজ হচ্ছে না।

কিন্তু ক্রুসেডারদের মধ্যেও রয়েছে কোন্দল। ফরাসি, অস্ট্রিয় এবং হসপিটালার নাইটরা, ইংরেজদের ভূমিকায় খুব একটা খুশি না। রাজা রিচার্ডও বাকিদের কথা পাত্তা দিতে চান না। নিজের ইচ্ছামতো যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

ওদিকে ইউরোপেও শুরু হয়েছে ঝামেলা। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ইতোমধ্যেই ফিরে গেছেন নিজের দেশে। ইংরেজ শিবিরে স্যাক্সন আর নর্মান কোন্দল! রাজা রিচার্ড যদিও স্যাক্সন আর নর্মানদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করেন না, তার পরেও কিছু নর্মান নাইট স্যাক্সনদের ক্রমাগত ছোটো করতে থাকে। অনেক স্যাক্সন বাইরে থেকে রিচার্ডের প্রতি আনুগত্য দেখালেও ভেতরে-ভেতরে ওরা চায় রাজাকে মেরে ইংল্যান্ডে আবার স্যাক্সন রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে।

খোদ ইংল্যান্ডের মাটিতে ঝামেলা চলছে। রাজা রিচার্ড তার ছোটোভাই রাজকুমার জনকে রাজার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন। জন খুবই দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, এছাড়া তীব্রভাবে স্যাক্সন-বিদ্বেষী। তার কারণে বর্তমানে অনেক নর্মান জমিদার স্যাক্সনদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছে। বনে-জঙ্গলে স্যাক্সন ডাকাতদের উপদ্রব বেড়েছে। রবিনহুড নামে এক ডাকাতের বীরত্বের কথা খুব শোনা যাচ্ছে, নটিংহ্যামের শেরিফকে নাকি রীতিমতো অতিষ্ট করে রেখেছে সে।

আবার এটাও শোনা যাচ্ছে যে নর্মান জমিদারদের উৎসাহ পেয়ে জন এখন নিজেই রাজা হতে চান; ইতোমধ্যেই গোপনে ফরাসিরা সমর্থন দিয়েছে জনকে।

তাই রাজা রিচার্ডও তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করে ইংল্যান্ড ফিরতে চান। সালাহউদ্দিনকে বেশ কয়েকটা চিঠিও লিখেছিলেন তিনি, কিন্তু সুলতান জবাব দিয়েছেন অনেক দেরি করে।

সত্য বলতে, আজকের যুদ্ধে জড়ানোর ইচ্ছাও ছিল না রিচার্ডের।

ঠিক তখনই স্যার ভার্ননের তাঁবুর বাইরে থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের চিৎকার।

***

তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন স্যার ভার্নন। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বিশ্বস্ত অনুচর জেফ্রি।

"কী ব্যাপার জেফ্রি? কী হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করলেন স্যার ভার্নন।

"ওই দেখুন, লর্ড," ডানদিকে ইশারা করল জেফ্রি। ওদিকে স্যাক্সন নাইট স্যার আরচার্ডের তাঁবু।

মশালের আলোয় স্যার ভার্নন দেখলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য! আঠারো-উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন স্যাক্সন সৈন্য। মেয়েটার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে আরব। নির্মমভাবে মেয়েটার কাপড় ছিঁড়ছে সেই সৈন্যরা আর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন স্যার আরচার্ড।

"থামো!" চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার ভার্নন। চমকে গেল সেই সৈন্যরা। সেই সুযোগে মেয়েটা দৌড়ে এসে লুকিয়ে পড়ল স্যার ভার্ননের পেছনে।

"কী নাম তোমার?" আরবিতে প্রশ্ন করলেন স্যার ভার্নন। আরবি বেশ ভালোই পারেন তিনি।

"আসিয়া," উত্তর দিল মেয়েটি, "বাঁচান দয়া করে!"

"তুমি কি সুলতান সালাহউদ্দিনের বাহিনীর কেউ?"

"না, আমার বাবা ব্যবসায়ী, দামেস্ক থেকে এসেছি আমরা। হুট করেই আমাদের কাফেলার ওপর হামলা চালিয়েছে এরা! মেরে ফেলেছে সবাইকে!" ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

"এসব কী, স্যার আরচার্ড?" রেগে উঠলেন স্যার ভার্নন, "নিরীহ লোকেদের ওপর হামলা কেন করেছে আপনার সৈন্যরা?"

"এহ্," ভেংচি কাটলেন স্যার আরচার্ড, "সালাহউদ্দিনের সব গুপ্তচর ধরা পড়লে এসবই বলে!"

"সুলতান সালাহউদ্দিন বলুন। উনি একজন রাজা!"

"বাপরে! আপনার দেখছি ওর প্রতি শ্রদ্ধার কমতি নেই!"

"একজন রাজাকে যেটুকু শ্রদ্ধা করা দরকার... সেটুকু আমরা করি... এটা ভদ্রতা, স্যার নাইট।"

"কী দিন এল! বেজন্মা উইলিয়ামের* বংশধররা আমাদের ভদ্রতা শেখাচ্ছে!"

"মুখ সামলে কথা বলবেন, স্যার নাইট! মহান উইলিয়ামের জন্যই আজ ইংল্যান্ড এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে!"

"তাই না? ফরাসিরা আমাদের নিয়ে হাসে জানেন? আজকের যুদ্ধতেই কী হল? তিরের বৃষ্টি চলছে আমাদের ওপর, তার পরেও রাজা রিচার্ড আক্রমণের হুকুম দিচ্ছেন না! কতটা সময় নষ্ট হল, কত ক্রুসেডার আহত হল! ভাগ্যিস হসপিটালার নাইটরা আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করে বসে, সেজন্যই আমরাও এগোলাম!"

"সেসব ঠিক আছে, কিন্তু এরপর যুদ্ধের নেতৃত্ব কিন্তু সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ডই দিয়েছেন!"

"জয়ের কৃতিত্ব নিতে হবে না? এই একটা জায়গায় আমি সালাহউদ্দিনকে শ্রদ্ধা করি। সে আক্রমণ করতে জানে। আমাদের রাজা সেটাও জানেন না।"

"রাজার সামনে তো খুব 'হুজুর হুজুর' করেন! এ-ই তাহলে স্যাক্সনদের আসল রূপ?"

---

* ইংল্যান্ডের প্রথম নর্মান রাজা উইলিয়াম দ্য কনকোয়েরার। হেস্টিংসের যুদ্ধে স্যাক্সনদের পরাজিত করে তিনি ইংল্যান্ড জয় করেন। তাঁর জন্ম নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল, এ-জন্য শুরুর দিকে তাঁকে 'উইলিয়াম দ্য বাস্টার্ড' বলা হতো। ইংল্যান্ডের রাজা হওয়ার পরে স্যাক্সনরাও তাঁকে এই নামে ডাকতে শুরু করে।

প্রথম অধ্যায়

ভয়

টেবিলে বসে বইটাতে মন দেওয়ার চেষ্টা করছে সাবরিনা। জেমস হারবার্টের 'নোবডি ট্রু'। হরর বই পড়তে খুবই ভালো লাগে ওর, কিন্তু আজ কেন যেন মন বসছে না। আর সত্যি বলতে কী, গত কয়েক দিন ধরে ওর সবসময়ই কেমন যেন অস্থির লাগে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। কটকটে রোদে ভেসে যাচ্ছে ওদের বিল্ডিং-এর সামনের রাস্তাটা। আজকে ভার্সিটিতে কোনো ক্লাস নেই ওর, তাই বাড়িতেই আছে। নইলে এই সময়ে বাড়িতে খুব একটা থাকে না সে।

ঘড়ির দিকে তাকাল সাবরিনা। সাড়ে তিনটা বাজে। বাবা-মা'র অফিস থেকে ফিরতে এখনও অনেক দেরি আছে। বইতেও মন বসছে না। বাধ্য হয়ে মোবাইলটা হাতে তুলে নিল ও।

ফেসবুকে সেই একই কাহিনি ঘুরেফিরে— সাম্প্রতিক কিছু বিষয় নিয়ে উসকানিমূলক পোস্ট আর মিম! দিন-দিন জায়গাটা বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

হুট করেই খাবার ঘর থেকে পিয়ানোর টু-টাং শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। খাবার টেবিলের ডানপাশে পিয়ানোটা রাখা। কিন্তু, সে ছাড়া এই মুহূর্তে বাড়িতে তো আর কেউ নেই। পিয়ানো কে বাজাচ্ছে?

না কি ওর মনের ভুল? অতিরিক্ত হরর বই পড়ে-পড়ে এই অবস্থা হয়েছে!

শব্দটা কিন্তু থামছে না, চলছেই!

ওদের কাজের বুয়া রহিমা খালা একটু আগেই নিচের একটা দোকানে গেছে কিছু জিনিসপত্র আনতে। কাছেরই একটা বস্তিতে থাকে এই মহিলা। এক সপ্তাহ হল কাজে লেগেছে সাবরিনাদের বাড়িতে।

লিফ্‌টে উঠলে নাকি তার মাথা ঘোরে! তাই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে।

সাবরিনাদের ফ্ল্যাট সাততলায়। মহিলা বেশ বয়স্ক, চলাফেরাও করে আস্তে আস্তে। খুব দ্রুত যে সে ফিরবে সেই আশাও নেই।

ওদিকে পিয়ানোর শব্দ ধীরে ধীরে জোরে হচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল সাবরিনা। খাবার ঘরের দিকে এগোতে লাগল সে।

আরে! একটা লোক মাথা নীচু করে পিয়ানো বাজাচ্ছে। কে এই লোকটা? কীভাবে ঢুকল বাড়িতে? তবে কি রহিমা খালা যাওয়ার পর সাবরিনা দরজা লাগায়নি? লাগিয়েছিল তো!

দরজার দিকে তাকাল সে। নাহ্, দরজা ভেতর থেকে লাগানো।

কে তবে এই লোকটা?

"এই, কে আপনি?" চেঁচিয়ে উঠল সাবরিনা।

কোনো উত্তর না দিয়ে একমনে পিয়ানো বাজাতে লাগল লোকটা।

এখন কী করবে সাবরিনা? রীতিমতো মাথা ঘুরছে ওর, আস্তে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। এই সময়ে বাড়িতে থাকা একদমই নিরাপদ নয়; নিচে গিয়ে দারোয়ানকে ডেকে আনতে হবে।

"দাঁড়াও," হিসহিসে কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা। মাথা তুলেছে সে। মধ্যবয়স্ক মানুষ, তবে চেহারাটা বেশ গম্ভীর।

"কে আপনি?" থমথমে গলায় প্রশ্ন করল সাবরিনা।

"আমি?" মৃদু হাসল লোকটা, "সুরের সাধক। পিয়ানো বাজাই আর ঘুরে বেড়াই। আমি কে? তা জানতে চাও? তা বলতে পারব না, তবে এই দেখো, আমি কী!" এই বলে উঠে দাঁড়াল সে।

ভয়ের একটা তীব্র স্রোত বয়ে গেল সাবরিনার শরীরে। লোকটার মাথা মানুষের, কিন্তু শরীরটা টিকটিকির— একটা অতিকায় টিকটিকির শরীরে মানুষের মাথা লাগানো!

হেসে উঠল সেই পিশাচ।

আর সহ্য করতে পারল না সাবরিনা, অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

***

অবাক হয়ে মোবাইলের দিকে চেয়ে আছে আসিফ।

ডা. আসিফ তাউজ, গ্রিনলাইফ ক্লিনিকের একজন ডাক্তার ও। অনেক প্রকার ক্ষত সে এর আগে দেখেছে, কিন্তু এই ক্ষতটা কেমন অদ্ভুত! কেউ যেন ছুরি দিয়ে একটা 'যোগচিহ্ন' এঁকে দিয়েছে মেয়েটার পিঠে।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল থেমে-থেমে জায়গাটা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর রক্তপাত থামাতে পেরেছে ডা. নায়লা আর ও। রক্ত জমতেই চাইছিল না!

ডা. নায়লাই ওকে ছবিটা তুলতে বলেছিলেন। প্রয়োজনীয় স্যাম্পল ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে, কিছু টেস্ট করা প্রয়োজন।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, মেয়েটার পিঠে এমন ক্ষত হল কী করে? করিডোরের বামদিকে তাকাল আসিফ। মেয়েটার মা-বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জনের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ।

মেয়েটার বাবা আসগরসাহেব বলেছেন, বিকাল পৌনে চারটার দিকে তাঁদের বাড়ির কাজের মেয়ে রহিমা বিল্ডিং-এর দারোয়ানকে দিয়ে তাঁর মোবাইলে ফোন করায়। দারোয়ান জানায় যে তাঁদের ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, রহিমা অনেক নক করার পরেও সাবরিনা দরজা খুলছে না।

হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন আসগরসাহেব। রহিমা তখনও ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ততক্ষণে মেয়েটার মা-ও এসে গেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসূয়া

রাত সাড়ে বারোটা বাজে।

আধো-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে বারেক— দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী 'চুলা বারেক'। এই অদ্ভুত নামটার পেছনে এক অদ্ভুত ইতিহাস রয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় শুধুই বন্ধুদের টাকাতে খেত বারেক, কাউকে কখনও খাওয়াত না; এমনকি পারলে তিনবেলাতে বন্ধুদের কাছেই খেত সে। এ-জন্য অনেকেই মজা করে বলত, "বারেকের বাড়িতে চুলা নাই! রান্না হয় না ওইখানে।"

সেই থেকে কখন যে বারেকের নাম 'চুলা বারেক' হয়ে গেছে তা সে নিজেও বোঝেনি। পড়াশোনাতে একদমই ভালো ছিল না বারেক। খুব ছোটো থাকতেই যোগ দেয় এলাকার কিশোর গ্যাং-এ। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ওকে। একটা সময়ে এলাকার ফেনসিডিল আর ইয়াবা ব্যাবসার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে সে। ধীরে-ধীরে এলাকা ছাড়িয়ে পুরো ঢাকা শহরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

সুযোগ বুঝে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এগিয়ে আসে। তাদের ছত্রছায়ায় বারেক হয়ে ওঠে আরও অপ্রতিরোধ্য। ওর বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতাও কারও ছিল না। গুম, খুন, ধর্ষণ— কোনোকিছুই বাদ দেয়নি বারেক। প্রকাশ্য দিবলোকে সবার সামনে জবাই করতেও তার জুড়ি ছিল না।

প্রায় পঞ্চাশটির ওপর মার্ডার কেসের আসামি হওয়ার পরেও প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। কেউ কিছুই বলত না।

গত পাঁচ বছরে নতুন এক ব্যাবসা শুরু করেছিল বারেক। ডেভিড নামে এক আমেরিকান লোকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল, এই লোকটা বিশেষ ধরনের পর্নো-ছবির ব্যাবসা করত।

আসলে ডেভিড ছিল একজন পেডোফাইল বা শিশুকামী। সে আস্তে আস্তে বারেককে ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেয়। ডার্ক ওয়েবে চাইল্ড-পর্নোগ্রাফির বিশাল চাহিদা, উন্নত বিশ্বের অনেক বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ টাকার বিনিময়ে ওইসব পর্ন দেখে।

কিন্তু সে-সব দেশের পুলিশ আর প্রশাসন খুবই কঠোর। তাই চাইল্ড-পর্নোগ্রাফি সাইটগুলো নজর দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এ-সব দেশে যৌনতা নিয়ে কথা বলাই ট্যাবু; এই দেশগুলোর অনেক নেতাই বুক ফুলিয়ে বলে, "পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌন হয়রানির হার অনেক বেশি! আমাদের এখানে কম!" কথাটার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক আছে। পশ্চিমে যেখানে সামান্যতম

হয়রানির শিকার হলেও পুলিশে রিপোর্ট করা হয়, সেখানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনেক মেয়ে ধর্ষিত হলেও সামাজিক সম্মানের কথা চিন্তা করে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে না। ফলে কাগজে-কলমে এই দেশগুলোতে যৌন হয়রানির হার 'কম'।

এই দেশগুলোর পথশিশুদের দিয়ে চাইল্ড-পর্নোগ্রাফি বানানো খুবই সহজ। বর্তমানে এগুলোর প্রচুর চাহিদা পশ্চিমা বিশ্বে।

একটা সময়ে চাইল্ড-পর্নের ব্যাবসাতে জড়িয়ে পড়ে বারেক। এলাকায় বেশ কয়েকটা এতিমখানা খোলে সে। সেই এতিমখানাগুলোতে প্রতিয়নিয়তই বাচ্চাদের দিয়ে পর্নো-ছবির শ্যুটিং চলত। শুরুর দিকে শখের বশেই কয়েকটা ভিডিয়োতে কাজ করেছিল বারেক।

কিন্তু পরবর্তীতে এটা তার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদিন রাতে একটা শিশুকে ভোগ না করলে ওর ঘুম আসে না।

কিন্তু সময় চিরকাল এক যায় না। হুট করেই দেশে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। নতুন যে দল এসেছে তারা বারেকের ওপর রামখ্যাপা। বেশ কয়েক জায়গায় টাকা ঢেলেছে বারেক, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। নতুন সরকার ওকে নিকেশ করেই ছাড়বে।

ইতোমধ্যেই ওর বিরুদ্ধে অনেকগুলো নতুন মামলা হয়েছে, পুরোনো মামলাগুলো সচল করা হয়েছে। পুলিশ পাগলের মতো খুঁজছে ওকে।

তাই আত্মগোপনে আছে সে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশে পালিয়ে যাবে। ক্ষমতার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।

এ-ছাড়া আর উপায় নেই।

"কী রে বারেক? কুত্তা!" বলে উঠল এক নারীকণ্ঠ। চমকে উঠল বারেক। ঘরের মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার হাতে ছোট্ট একটা কুড়ুল।

ঘরের দরজার দিকে তাকাল বারেক। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। এই মেয়েটা ঢুকল কী করে? আগে থেকেই ঢুকে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিল নাকি?

যাক, রাতের বেলা একটা মেয়ে তো পাওয়া গেল। কিন্তু ওর হাতে কুড়ুল কেন? হয়তো বারেককে খুন করতে এসেছে। ওর তো শত্রুর অভাব নেই! যা-ই হোক, মেয়েমানুষ গায়ের জোরে ওর সঙ্গে পারবে না।

"কে রে তুই?" কুটিল হাসি ফুটে উঠল বারেকের মুখে।

"বারেক! আমার কোনো নাম নাই। তবে আপাতত, আমাকে তুই 'মৃত্যু' বলে ডাকতে পারিস।"

"তা-ই না?" একলাফে উঠে দাঁড়াল বারেক, তারপর একটা ঘুষি চালিয়ে দিল মেয়েটাকে লক্ষ করে। চকিতে পিছিয়ে গেল মেয়েটা, তারপর পালটা ঘুষি মারল বারেকের মুখে!

বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ল বারেক। অবাক হয়ে গেল সে— একটা মেয়ের গায়ে এত জোর! রীতিমতো রক্ত বের হচ্ছে বারেকের নাক দিয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্ধ শরীর

পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ফুঁকছে টগর। রাগে রীতিমতো ফুঁসছে সে। একটু আগেই গুমতিপাড়া বেশ্যাখানার সর্দারনি ওকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। শুধু কি তা-ই? এটাও বলেছে, "ফকিন্নির পোলা, টেকা নাই তো আইছোস কেন? হাত মার গিয়া! টেকা নাই আবার মাগি লাগানোর ইচ্ছা? শখ কত!"

আশেপাশের কয়েক গ্রামের মধ্যে শুধু গুমতিপাড়াতেই বেশ্যাখানা আছে। টগরদের নিশিপুর গ্রামের অনেকেই ওখানে যায়।

আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে ওই বেশ্যাখানার গ্রাহক টগর। ওখানকার প্রতিটি মেয়ের শরীরের সব খাঁজের বিবরণ মুখস্থ ওর।

সেই টগরকে আজ বের করে দিল? কয়েক মাস হল ওর ব্যাবসা ভালো যাচ্ছে না, হাতে টাকা-পয়সাও তেমন নেই; একটু বাকিতে ফুর্তি করতে গেছিল। সেই সুযোগও দিল না সর্দারনি!

'নটির ঘরে নটি! চালাও নটিবাজার, আবার এত ভাব! এইবার খালি টেকা হোক, আর জীবনেও তোর বেশ্যাখানায় যামু না! শহরে যামু! ওইখানের শিক্ষিত মাইয়া লাগামু!' আপনমনে বলে ওঠে টগর।

আরে... পুকুরের ওপাশে কী দেখা যায়। কে যেন বসে আছে না?

ঘুরপথে পাঁচ মিনিটেই সেদিকটায় পৌঁছল টগর। পুকুরের দিকে মুখ করে বসে আছে একটা মেয়ে— একমাথা ঘন কালো চুল, উন্মুক্ত পিঠ— মেয়েটার পরনে কিছুই নেই!

ঠোঁট চাটল টগর।

কে ওই মেয়েটা? কোনো পাগলি নাকি? টগরের বন্ধু মানিক মফস্সলে থাকে, ওখানে রিকশা চালায় সে। ওই ব্যাটা টগরকে বলেছিল, "দোস্ত, সুযোগ পাইলেই রাস্তার পাগলিগো লাগাই! এগো গায়ের পচা গন্ধে খুব মজা... টেকাও দিতে হয় না! ফাও ফাও মজা... "

মেয়েটের পিঠের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে টগর। মসৃণ চামড়া। মোমের মতো। গুমতিপাড়া বেশ্যাখানার কোনো মেয়ের ত্বক এমন না।

'এ তো দেখি সিনেমার নায়িকা,' উত্তেজিত হয়ে উঠল টগর। মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে। একটুও নড়ছে না।

ধীরে-ধীরে ওর দিকে এগিয়ে গেল টগর। হাত রাখল পিঠে, "এই মাইয়া— "

তখনই ঘুরে তাকাল মেয়েটা। হাসছে সে। মুখে কী বড়ো দাঁত! লাল টকটকে চোখদুটো রীতিমতো জ্বলছে! সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল এখন মেয়েটার পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছে টগর— কোমর পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে সেই শরীর। বাকিটুকু কে যেন কেটে ফেলেছে— নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে!

"ও আল্লাহ্ গো," একলাফে সরে গেল টগর। পালাতে হবে ওকে, কিন্তু তখনই মেয়েটার হাতের ওপর থেকে বেরিয়ে এল দুটো ডানা।

ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। অদ্ভুত সেই চিৎকার— যেন একসঙ্গে অনেকগুলো মোরগ ডাকছে!

দৌড়াতে লাগল টগর... তিন থেকে চার সেকেন্ড... উড়ে এসে ওর ঘাড়ে কামড় দিল মেয়েটা।

"ওরে খোদা," চেঁচিয়ে উঠল টগর, "ছাড় মাগি... ছাড় আমারে!"

কথাটা শেষ করতে পারল না টগর, একটানে ওর মাথাটা ছিঁড়ে নিল পিশাচিনী। মাটিতে পড়ে গেল প্রাণহীন দেহটা। রক্তে ভেসে গেল সেই জায়গাটা।

***

"গেরামের নতুন হাসপাতালে যাইবেন?" অবাক হল ভ্যানওয়ালা, "ওইখানে কী কাজ?"

গ্রামের লোকদের সব ব্যাপারেই কৌতূহল। অন্য কেউ হলে বিরক্ত হয়ে যেত, কিন্তু আসিফ অত সহজে বিরক্ত হয় না।

"আমি ডাক্তার," মৃদু হাসল সে।

"ভাইজান ডাক্তার? আহেন আহেন, উইঠা বসেন, লইয়া যাইতেসি," খুশি হয়ে ওঠে ভ্যানওয়ালা, "এই হাসপাতাল হইয়া যা ভালো হইসে... গেরামের ভেতরেই আমরা চিকিৎসা পাইতাসি!"

মৃদু হাসল আসিফ। এরা বেশি কৌতূহল দেখালেও বিজনেস ম্যাগনেটদের ফন্দি বোঝে না। গত কয়েক মাসে কতগুলো গ্রামে নিজেদের ছোটো-ছোটো কয়েকটা শাখা বানিয়েছে আসিফদের ক্লিনিক-কর্তৃপক্ষ। এগুলোতে এখন নামমাত্র মূল্যে গ্রামের লোকেদের চিকিৎসা হচ্ছে। স্বভাবতই জেলাশহরের সরকারি হাসপাতালের চেয়ে এখানকার চিকিৎসা ভালো, তাই গ্রামের লোকেরা এগুলোতেই যাচ্ছে।

ধীরে-ধীরে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ভালো চিকিৎসায়। এবং এই প্রক্রিয়াতেই একটা সময়ে ফি বাড়াতে শুরু করবে কর্তৃপক্ষ। ততদিনে এই ক্লিনিকগুলোতে যাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে লোকেদের, তাই ফি বাড়লেও ওরা এখানেই আসবে। কারণ স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের চেয়ে অনেক ভালো চিকিৎসা এখানে।

এভাবেই কর্তৃপক্ষ বড়ো লাভ তুলে নেবে।

আসিফকে পাঠানো হয়েছে নিশিপুর শাখায়, কয়েক দিন এখানে থেকে এখানকার কাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে একটা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য।

"আপনি কি এখন থেকে ওই হাসপাতালেই থাকবেন, ডাক্তারসাব?"

চতুর্থ অধ্যায়

ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি

বাথরুমের চার নম্বর স্টলটায় ঢুকেছে হাসিব। প্রস্রাব করার জন্য প্যান্টের চেইন খুলতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হল তার; মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল, মনে হচ্ছিল পড়েই যাবে, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে।

প্রস্রাব করে বেরিয়ে এল সে। বাথরুমে আরও তিনটে স্টল আছে, সবগুলোই ভেতর থেকে বন্ধ... মানে, লোক আছে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে।

এলাকায় নতুন খোলা 'ইভিনিং টাইম' রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে এসেছে ও। সঙ্গে রয়েছে দুই বন্ধু— আকাশ আর হৃদয়।

দু'দিন আগেই ঈদ ছিল, তাই রেস্তোরাঁ ফাঁকাই। ওদের তিনজনেরও এই সময়ে ঢাকায় থাকার কথা না। একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ওরা তিনজন। ক্যাম্পাস খুলবে আরও তিন-চারদিন পর।

কিন্তু কিছু মানুষ আছে না, একবার ঢাকার হাওয়া পেলে আর বাড়িতে মন টেকে না? এরা তিনজন ঠিক সেরকম। তাই আজ সকালেই ঢাকাতে ফিরেছে সবাই।

হাসিব এসে দেখল আকাশ আর হৃদয়ের খাওয়া হয়ে গেছে। ও খাওয়া শেষ করেই বাথরুম গেছিল। আশেপাশে তাকাল আসিফ, এই রেস্তোরাঁর সাজসজ্জা বেশ অদ্ভুত— দেয়াল, মেঝে, ছাদ সব জায়গাতেই অসংখ্য সূর্যমুখী ফুলের ছবি। শুরু থেকেই ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগছিল হাসিবের। ফুলগুলোর দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে যেন ওগুলো ফুল নয়, বরং অসংখ্য চোখ— স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে!

শরীরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল হাসিবের।

"খাওয়া শেষ নাকি তোদের?" প্রশ্ন করল সে।

"হ্যাঁ," উত্তর দিল হৃদয়।

"তাহলে আমি বিল দিয়ে আসছি, তোরা নিচে নাম," এই বলে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল হাসিব। এমনটাই কথা ছিল, ও রাতের খাবারের বিল দেবে, তারপর সবাই মিলে আকাশের রুমে বসে নেশাপানি করবে। কাছেই ওর বাসা। নেশাপানির খরচ আকাশ আর হৃদয় দেবে।

কাউন্টারে বসা লোকটা কেমন যেন গম্ভীর। চুপচাপ টাকা বুঝে নিল। অন্য নতুন রেস্তোরাঁগুলোতে কত কী জিজ্ঞাসা করে, যেমন— 'খাবার কেমন ছিল,

স্যার?', 'সার্ভিস ভালো তো স্যার?', 'কী মনে হচ্ছে স্যার, আমাদের এখানে আবার আসা যায়?'

কিন্তু এই লোকটা কিছুই বলল না। নিঃশব্দে খুচরা পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিল হাসিবের হাতে।

নিচে নেমে এল হাসিব। রাস্তাঘাট ফাঁকাই, রাতও অনেকটা হয়েছে। খানিকটা দূরে এক ডাবওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে।

"চল, কয়েকটা ডাব নিই," চোখ নাচাল হৃদয়। হেসে উঠল আকাশ। এটা হৃদয়ের অনেক পুরোনো অভ্যাস; ফেনসিডিলের সঙ্গে ডাবের পানি মিশিয়ে খায় ব্যাটা।

ডাবওয়ালার কাছে এগিয়ে গেল ওরা। লোকটা বেশ বয়স্ক।

"ডাব দেন, মামা... দুই-তিনটা," বলল হৃদয়।

"কাইটা দিমু?"

"নাহ্, এমনিই দেন।"

তখনই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আকাশ আর হৃদয়কে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে এল হাসিব, ওর চোখে কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

মুহূর্তেই ডাবওয়ালার হাত থেকে দা কেড়ে নিল। তারপর নিজের গলায় গভীর একটা পোঁচ দিল। রক্ত ছলকে বেরিয়ে এল, মেখে গেল হাসিবের জামা-কাপড়ে!

"হায় আল্লাহ্!" চেঁচিয়ে উঠল আকাশ, "হাসিব, তুই..." কথাটা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই এককোপে ওর গলাটা নামিয়ে দিল হাসিব।

হৃদয় যেন পাথরের মতো জমে গেছে। খুব জোরে ওর বুকের ওপর কোপ মারল আসিফ।

"ও মা গো!" মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হৃদয়। ডাবওয়ালা ততক্ষণে ডাবগুলো ফেলে পাশের গলির দিকে দৌড় দিয়েছে।

সামনে ছুটতে লাগল হাসিব। হাতে দা। গলা এতটাই কেটে ফেলেছে যে মাথাটা অনেকটা পেছনদিকে হেলে পড়েছে, রক্তে লাল হয়ে আছে পুরো শরীর—স্ট্রিটলাইটের আলোয় রীতিমতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে ওকে!

বেশি দূর যেতে পারল না সে, তার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে!

***

নীল একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরে বসে আছে নিয়েলা। বয়স যেন আবার অনেক কমে গেছে ওর। আজকে মনটা বেশ অস্থির... একমনে প্রভুকে ডেকে চলেছে সে।

ধীরে ধীরে লালচে একটা আলোয় ভরে গেল ঘরটা, আর সেই আলোর ভেতর থেকে ভয়ংকর বিকৃত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, "কী হয়েছে?"

"প্রভু," মাথা নীচু করল নিয়েলা, "শহরে ভয়ংকর এক খারাপ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছি।"

"জানি।"